ক্ষমতা ছাড়ার আগে

শেষ ভাগ বাটোয়ারা

শেষ হয়ে আসছে ক্ষমতার মেয়াদ। আর সময় নেই। যা করার করতে হবে এখনি। যে যেভাবে পারছে নিজের আখের গোছাচ্ছে। চলছে দখল, চাঁদাবাজি, তদবির ... নেতা-পাতিনেতারা এখন মহাব্যস্ত ...

লিখেছেন **অনিরুদ্ধ ইসলাম** ও **মনিরুল ইসলাম**

নির্বাচনী হজ শেষে মদিনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হঠাৎ করে নির্বাচনের ঘোষণায় আওয়ামী লীগ মন্ত্রী, এমপি, নেতা-পাতি নেতাদের মাথায় বাজ ভেঙে পড়েছিল। সরকারের শেষ বছরে মন্ত্রী-এমপিদের এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের তাগিদ ছিল প্রথম থেকেই। কিন্তু নির্ধারিত মেয়াদের আগে ক্ষমতা ছাড়তে হলে তাদের শেষ গোছানোর কাজটা হবে না। বিএনপি তার ক্ষমতা ছাড়ার আগে প্রতি দলীয় এমপিকে নিজ এলাকার জন্য পঁচিশ লাখ টাকা করে বরাদ্দ দিয়েছিল। সেই বরাদ্দ এলাকার কতটুকু কাজে লেগেছে এবং নিজেদের পকেটে কত গেছে পরবর্তীকালে ঐ পঁচিশ লাখ টাকা বরাদ্দ আত্মসাতের অভিযোগে ঐ সকল এমপিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলাই তার প্রমাণ। কিন্তু তাতেও কারো লোভ ঠেকে থাকে না। সুতরাং শেষ মুহূর্তের লুটপাটটি সম্পন্ন করতে না পারায় আওয়ামী মহলে রীতিমত একটা হাহাকার উঠেছিল। এখন নির্বাচন পিছিয়ে যাওয়ায় সবাই নিশ্চিত হয়েছেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে শেষ মুহূর্তের ভাগ-বাটোয়ারার কাজটি চলছে দ্রুতগতিতে।

এই শেষ মুহূর্তের ভাগ-বাটোয়ারার শীর্ষ তালিকায় রয়েছে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়। এই স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন কাজের মাঝে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার টন গমের বরাদ্দ নিয়ে লুটপাটের ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশ পেয়ে যাওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ঐ বরাদ্দ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীকে অন্যত্র বদলি করা হয়েছিল। এবার খোদ প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের উদ্দেশ্যে মাটির কাজের জন্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেই অতিরিক্ত এক লাখ টন গম বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও রাজনৈতিক নেতাদের নামে এই বিশেষ ও বাজেটবহির্ভূত গম বরাদ্দ করা হবে। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ৪৬৪টি উপজেলায় ৭৪

হাজার ১৩০ মেট্রিক টন গমের বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। মসজিদ, মন্দির, রাস্তাঘাট সংস্কার ও পুনর্বাসনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে যে নীতিমালা তৈরি করে দেয়া হয়েছে তাতে এই বরাদ্দের ব্যাপারে নিয়মমাফিক গঠিত উপজেলা সমন্বয় কমিটির কোনো ভূমিকা থাকছে না। কমিটিকে পাশ কাটিয়ে এককভাবে জেলার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রকল্প অনুমোদন করবেন। ফলে এখন সবটাই সরকারি দলের ভোগে চলে যাচ্ছে। বিরোধী দলের এমপিরা তাদের সুপারিশকৃত কোনো প্রকল্পের বরাদ্দ পেলেও তা তাকে পেতে হচ্ছে ঐ ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সঙ্গে ভালো সম্পর্কের ভিত্তিতে। কিন্তু নির্বাচন সামনে থাকায় এই অনুমোদনের কাজ মূলত যাচ্ছে সরকারদলীয় সংসদ সদস্য, চেয়ারম্যান-মেম্বার ও সরকারদলীয় সম্ভাব্য প্রার্থীর নামে। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই সরকারের দুই মাসের মেয়াদের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। তা ছাড়া স্থানীয় মৌসুম কার্যত শেষ হওয়ার পথে। বর্ষায় যে ঐ মাটির কাজ হবে না তা জেনেও ঐ গম বরাদ্দ দেয়ার অর্থ বাজারে বিক্রি করার ব্যবস্থা করা। ইতিমধ্যেই কৃষকদের তরফ থেকে অভিযোগ এসেছে যে, বোরো ওঠার সময় এই অতিরিক্ত গম-চাল বরাদ্দ দেয়ায় বাজারে ধানের দাম পড়ে গেছে।

বিভিন্ন জায়গায় ছাত্রলীগ, যুবলীগ, আওয়ামী লীগ সাইন বোর্ড টাঙ্গিয়ে জায়গা দখল করেছে বেআইনীভাবে অফিসের নামে

ঐ গমের হরিলুট চলছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়েও। ঐ মন্ত্রণালয়ে সরকারি দলের তদবিরকারকদের ভিড়ে মন্ত্রণালয়ে ঢোকার কোনো উপায় নেই। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় অনেক আগেই বিশেষ প্রকল্পের আওতায় কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি এবং টেস্ট রিলিফের চাল দেয়া শুরু হয়েছিল। এই দু'খাতে ২ লাখ ৫০ হাজার টন চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এরও অধিকাংশই গেছে সরকারি দলের কাছে। বিরোধীদলের ১৫ জন সংসদ সদস্যকে মাত্র ৫ হাজার টন চাল দেয়া হয়েছে। ত্রাণ মন্ত্রণালয় আরো ৭৫ হাজার মেট্রিক টন চালের চাহিদা জানিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়কে পত্র দিয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় সাধারণত এ ধরনের বরাদ্দের ব্যাপারে রক্ষণশীল হলেও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশে ইতিমধ্যে ২৫ হাজার টনের জন্য সম্মতি দিয়েছে। এটাও যে সরকারি দলের ভোগে যাবে সেটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

কেবল চাল নয়, প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে বিলি হচ্ছে শাড়ি। প্রতি সংসদ সদস্য ৪০০ পিস করে শাড়ি পাচ্ছেন। আর ঐ শাড়ি যে দলীয় কর্মীদের কাছে পৌঁছাচ্ছে সেটাও নিশ্চিত করছে দলীয় সংসদ সদস্য ও নেতারা।

বাদ থাকেনি ধর্ম মন্ত্রণালয়ও। প্রতি সংসদ সদস্যের জন্য ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দের বাইরে দলীয় সংসদ সদস্য, নেতা ও পাতি-নেতাদের সুপারিশের ভিত্তিতে দেয়ার জন্য মসজিদ, মন্দির, মাদ্রাসা, মক্তব প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের নামে আরো দু' কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

১৯৯৯ সালে গুলশান, বনানী, উত্তরায় ২৪২টি প্লট তাড়াহুড়া করে বরাদ্দ দিয়ে 'আওয়ামী পল্লী' লীগের একটা উদ্যোগ সংবাদপত্রে তীব্র সমালোচনার মুখে ভেস্তে গিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঐ সমালোচনায় ক্ষুব্ধ হয়ে বিদেশ সফর থেকে ফিরে এসে ঐ বরাদ্দই বাতিল করে দেন। এখন ক্ষমতা থেকে সরে যাবার আগে ঐ আওয়ামী পল্লীরই এক সম্প্রসারিত গ্রুপ দেয়া হচ্ছে উত্তরায়। দলীয় ব্যক্তিদের সন্তুষ্ট করতে রাজউককে দিয়ে পানির নিচের জমিও বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্লট হিসেবে জমির উন্নয়ন দূরে থাক, এখন পর্যন্ত ঐ সম্প্রসারিত উত্তরা প্রকল্পে জমির অধিগ্রহণও করা হয়নি। জানা গেছে যে জমি হাতে পাওয়ার পর রাজউক নিজস্ব বিধিমালা অনুযায়ী আরো সময় নিয়ে প্লট বরাদ্দ করতে চেয়েছিল। তাদের পরিকল্পনা ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ঐ প্লট বরাদ্দের তালিকা চূড়ান্ত করা, যাতে রাজনৈতিক প্রভাব ছাড়াই প্লট বরাদ্দ দেয়া যায়। কিন্তু মন্ত্রণালয় অপেক্ষা করতে রাজি ছিল না। ক্ষমতা ছাড়ার আগেই তারা এই প্লট বরাদ্দ চূড়ান্ত করতে বিশেষ তাগাদা দেয়। ফলে রাজউক এখন ২ হাজার ৬৮৭ জনের নামে প্লট বরাদ্দের একটা তালিকা প্রকাশ করেছে। এর অধিকাংশই যে সরকারি দলের তা বলাই বাহুল্য। অবশ্য সংবাদপত্রে নামের তালিকা দেখে কাউকে চেনার উপায় নেই। তবে সমালোচকদের মুখ বন্ধ করতে এবারের তালিকায় বিরোধী দলের কয়েকজন সংসদ সদস্য ও বিরোধী দল সমর্থক সাংবাদিকদের নামও রাখা হয়েছে। কিন্তু এই প্লট বরাদ্দের মধ্যে ফাঁক রয়ে গেছে। উত্তরায় ২,৩,৪ ও ৯ প্রভৃতি সেক্টরে যেসব প্লট বরাদ্দ হয়েছে তারা তাদের জমি নিয়ে নিশ্চিত থাকতে পারবেন। কিন্তু উত্তরা ও মিরপুর থানার পাঁচটি মৌজায় (বাউলিয়া, নলভোগ, চণ্ডালভোগ, বানাভোলা ও দয়াবাড়ি) যেসব জমি এই প্রকল্পের আওতায় রয়েছে তার অধিগ্রহণ ও মাটি ভরাট না হওয়ায় 'গায়েবি প্লট' হিসাবেই রয়ে গেছে। এসব জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণের টাকা নিয়ে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে রাজউকের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে তাতে সরকারি দলের কিছু যায় আসে না। একবার বরাদ্দ দেয়া হলে ঐ জমি বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্ব রাজউক এবং সরকারের

আওয়ামী লীগ একুশ বছর পর ক্ষমতায় এসেছিল। একুশ বছর ধরে জমিয়ে রাখা ক্ষুধা তারা যে যেভাবে পারে মিটিয়েছে এই ক'বছরে। আর তাছাড়া নির্বাচন রয়েছে সামনে। তার খরচও তো জোটানো চাই। তাই শেষ মুহূর্তের এই ভাগ-বাটোয়ারা

থাকবে। তবে বাড্ডার 'জে ব্লকে'র মত এসব বরাদ্দপ্রাপ্তদের দীর্ঘদিন অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটাতে হতে পারে। তবুও ঢাকায় এক ফালি জমি। সোনার চেয়ে দামি তা– সে পানির নিচে হোক, আর ওপরে হোক।

আওয়ামী সরকার অবশ্য তাদের এই সম্পদ সংগ্রহ সন্ধানে আকাশ, মাটি, পানি কিছুই বাকি রাখেনি। ক্ষমতায় গিয়েই সরকার দেশের আকাশসীমা রক্ষার নামে মিগ-২৯ কেনার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দেশের জলসীমা রক্ষার জন্য ফ্রিগেট কেনারও ব্যবস্থা হয়। সরকারের এই দুটি প্রতিরক্ষা ক্রয়েই চরম দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। জাতীয় সংসদের প্রতিরক্ষা বিষয়ক সংসদীয় কমিটিতে উক্ত দুই ক্রয়ের বিষয়ে আলোচনা হলেও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে উপযুক্ত কাগজপত্রাদি সরবরাহ না করায় ঐ আলোচনা কোনো কার্যকর রূপ নিতে পারেনি। ফ্রিগেট কেনা নিয়ে সংসদ সদস্যদের দক্ষিণ কোরিয়া ঘুরিয়ে আনা হয়েছে। আর মিগ-২৯ নিয়ে সংসদীয় কমিটির আলোচনা বারবার স্থগিত হয়েছে। তবে বাইরের সমালোচনা থামিয়ে রাখা যায়নি। গণফোরাম নেতা ড. কামাল হোসেন পল্টনের জনসভায় কয়েকবারই মিগ-২৯ কেনা নিয়ে দুর্নীতির কাগজপত্রাদি প্রকাশ করার হুমকি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তার হাতে যে প্রমাণ রয়েছে তা তিনি উপযুক্ত সময় প্রকাশ করবেন।

কিন্তু সব সমালোচনার পরও প্রতিরক্ষা ক্রয়ে যে মুনাফা লোটা যায় সে কারণে ক্ষমতা থেকে যাওয়ার আগেই আরও কয়েকটি মিগ-২৯ ও পূর্বের কেনার মিগ-২৯-এর স্পেয়ার পার্টস কেনার জন্য সরকারি তরফ থেকে উদ্যোগ-আয়োজন প্রায় শেষ করে ফেলা হয়েছে বলে খবর বেরিয়েছে। বিমান বাহিনী প্রধানের সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রকাশিত এই খবর অবশ্য পরে অস্বীকার করা হয়েছে। তবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই ক্রয়ের বিষয়টি যাতে সরকারের ক্ষমতা ত্যাগের আগেই শেষ হয় তার জন্য তাড়াহুড়ো রয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানাচ্ছেন।

ক্ষমতা এবং দুর্নীতি দুটি এখন ওতপ্রোত শব্দ। আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর ছেলে বাড়ি দখল করছেন, করছেন চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস। প্রভাবশালী একজন মন্ত্রীর ছেলেকে নিউইয়র্কে একটি বাড়ি উপহার দিয়েছে একটি কোম্পানি।

বাংলাদেশের বন ধ্বংস চলছে গত ৩০ বছর ধরে। আওয়ামী সরকারের শুরু থেকে সেই ধারা অব্যাহত আছে। ক্ষমতার শেষ সময়ে এসে আরো বেড়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম, সুন্দরবন কোনো কিছুই বাদ যাচ্ছে না ধ্বংসের হাত থেকে। জানা যায়, বন ধ্বংসের নেতৃত্বে রয়েছেন এক মন্ত্রীপুত্র।

শুধু মন্ত্রীরাই নন, আমলাতন্ত্রও শেষ সময়ে এসে ভাগ-বাটোয়ারায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ন্যাম ভিলেজের নামে বহুতল আবাসিক কোয়ার্টার নির্মাণ চলছে। ন্যাম সম্মেলন কবে হবে ঠিক নেই। এগুলো হবে আমলাদের কোয়ার্টার, তাই কাজের এত তোড়জোড়।

যে যেভাবে পারে উপার্জন করছে। দুর্নীতির তদন্তের জন্য কমিটি গঠন হচ্ছে। কিন্তু আবার অদৃশ্য কারণে সেই কার্যক্রম ঝিমিয়ে পড়ছে।

দেশের মোবাইল টেলিফোন কোম্পানিগুলোর চুক্তি বহির্ভূত তৎপরতাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য প্রায় তিন বছর আগে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকে গঠন করা হয় পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি সাব-কমিটি। সরকার দলীয় সদস্য হুইপ মিজানুর

রহমান মানুকে করা হয় এই কমিটির আহ্বায়ক। গঠিত হবার পর খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে বেশ কয়েকটি বৈঠক আয়োজন করেন তিনি। আলোচনা হয় প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম (পিবিটিএল) বা সিটিসেলের কার্যক্রম নিয়ে। কথা ছিল পর্যায়ক্রমে সবগুলো মোবাইল ফোন কোম্পানি নিয়েই আলোচনা হবে। কিন্তু বছর খানেকের মাথায় হঠাৎ করেই স্তিমিত হয়ে পড়ে এই সাব-কমিটির কার্যক্রম। দীর্ঘদিন পর সম্প্রতি এই সাব-কমিটির একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সংসদ ভবনে। কিন্তু কবে শেষ হবে তদন্ত কাজ তা নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা সেখানে হয়নি। অথচ সরকারের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি লঙ্ঘন করে 'ইনকামিং কলচার্জ' আরোপ এবং ক্ষমতার অতিরিক্ত লাইন বিক্রিসহ বিভিন্ন রকম বেআইনি তৎপরতায় লিপ্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে একাধিক মোবাইল ফোন কোম্পানির বিরুদ্ধে। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না।

সাবেক স্বৈরশাসক লে. জে. এরশাদের শাসনামলে চীন থেকে বিপুল অর্থ ব্যয়ে কেনা হয়েছিল তিনটি সামুদ্রিক জাহাজ। বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের জন্য ক্রয়কৃত জাহাজগুলো হচ্ছে 'বাংলার মুখ ও বাংলার দূত'। এসব জাহাজ ক্রয়ের ক্ষেত্রে বড় রকমের দুর্নীতি হয়েছে মর্মে অভিযোগ আসায় তদন্তের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকে ১৯৯৮ সালের শেষ দিকে গঠন করা হয় একটি সাব-কমিটি। এটির আহ্বায়ক করা হয় খাদ্য উপমন্ত্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভুকে। ২০০০ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই সাব-কমিটি তাদের কাজ এগিয়ে নিয়ে যায় অনেক দূর। একপর্যায়ে তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, জাহাজগুলো সরবরাহকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলার জন্য তারা চীন সফরে যাবেন। এই পর্যন্তই শেষ। তারপর আর কোনো বৈঠক হয়নি সাব-কমিটির এবং চীন সফরের বিষয়টিও এখন বিস্মৃতির পর্ব। অভিযোগ আছে যে, উল্লিখিত জাহাজগুলো ক্রয়ের সময় অতিরিক্ত দাম দেখিয়ে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি লে. জে. এরশাদ এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা।

ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ ডেসার পাহাড়সম দুর্নীতি-অনিয়মের অভিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য একটি সংসদীয় সাব-কমিটি গঠন করা হয় ১৯৯৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকে গঠিত এই সাব-কমিটির আহ্বায়ক করা হয় আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ইমরান আহমেদকে। দায়িত্ব পাবার পর সদস্যরা একাধিক বৈঠকে মিলিত হওয়া ছাড়াও ডেসার অফিস এবং গুদামে গিয়ে সরেজমিন পরিদর্শন করে আসেন। এতে গুরুতর সব অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র বেরিয়ে আসে এবং সে সময় সাব-কমিটির সদস্যদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বিভিন্ন পত্রিকায় বড় বড় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু ২০০০ সালের গোড়া থেকেই এই সাব-কমিটি রহস্যজনক কারণে নীরব হয়ে যায় এবং গত প্রায় দেড় বছরে আর কোনো বৈঠক হয়নি। অবশ্য খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে, কমিটির জাতীয় পার্টি দলীয় সদস্য আব্দুল মুকিত খান এককভাবে তৎপরতা চালিয়ে একটি খসড়া রিপোর্ট তৈরির পর তা সাব-কমিটির আহ্বায়ক ইমরান আহমেদের কাছে জমা দিয়েছেন। কিন্তু তিনি এখনো তা চূড়ান্ত করে স্থায়ী কমিটিতে উপস্থাপন করেননি।

> ১৯৯৯ সালে গুলশান, বনানী, উত্তরায় ২৪২টি প্লট তাড়াহুড়া করে বরাদ্দ দিয়ে 'আওয়ামী পল্লী' লীগের একটা উদ্যোগ সংবাদপত্রে তীব্র সমালোচনার মুখে ভেস্তে গিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঐ সমালোচনায় ক্ষুব্ধ হয়ে বিদেশ সফর থেকে ফিরে এসে ঐ বরাদ্দই বাতিল করে দেন।

শেষ সময়ের ভাগ-বাটোয়ারায় ব্যস্ত সবাই। দুর্নীতি বা অনিয়মের তদন্ত নয়। কিছু উপার্জনই যেন উদ্দেশ্য।

রাজধানীর মিরপুর ও মোহাম্মদপুর এলাকায় সরকারি মালিকানাধীন জমিসমূহের বর্তমান অবস্থা অবৈধ দখল, প্লট বরাদ্দে অনিয়ম ইত্যাদি বিষয়ে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ রিপোর্ট প্রদানের দায়িত্ব দিয়ে ১৯৯৯ সালের শেষ ভাগে গঠন করা হয় একটি সংসদীয় সাব-কমিটি। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকে গঠিত এই সাব-কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয় আওয়ামী দলীয় সংসদ সদস্য মুস্তাফিজুর রহমানকে। কিন্তু গত প্রায় দু'বছরে এই সাব-কমিটির কোনো তৎপরতাই দেখা যায়নি। এ ধরনের তদন্তের ক্ষেত্রে সরেজমিন পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও উল্লিখিত সাব-কমিটি তা করেনি, এমনকি মিলিত হয়নি কোনো বৈঠকেও।

এভাবেই রহস্যময় নিষ্ক্রিয়তায় নিপতিত হয়েছে আরও প্রায় ডজনখানেক সংসদীয় সাব-কমিটি। দেশের চা বাগানগুলোর জমির অপব্যবহার ও বরাদ্দে অনিয়মের বিষয়টি তদন্তের জন্য দুটি পৃথক সাব-কমিটি গঠন করা হয়। ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকে। জানা গেছে, দুটি সাব-কমিটিই বেশকিছু চা বাগান এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করে বহুবিধ অনিয়মের হদিস পেয়েছে। একটি সাব-কমিটি তদন্তের খসড়া রিপোর্টও তৈরি করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর আলোর মুখ দেখেনি। সুন্দরবনের কাঠ চুরি এবং বন্যপ্রাণী নিধনের বিষয়টি তদন্তের জন্য একটি সংসদীয় সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছিল পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকে। শোনা গেছে যে, এই সাব-কমিটি খুব তাড়াতাড়িই তাদের তদন্ত কাজ সম্পন্ন করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোথায় গেল সেই তদন্তের রিপোর্ট তা আর জানা যায়নি। বিভিন্ন জেলায় সিভিল সার্জনদের বহুল আলোচিত দুর্নীতির মাধ্যমে এমএসআর খাতের শতাধিক কোটি টাকা লোপাটের ঘটনা তদন্তের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকে একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছিল ১৯৯৮ সালে। জাতীয় পার্টির এমপি তাজুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন এই কমিটির প্রথম পর্যায়ের রিপোর্টের প্রেক্ষিতে ৭ সিভিল সার্জনসহ স্বাস্থ্য বিভাগের প্রায় ৪০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চাকরিচ্যুত করা হয়। কিন্তু তাদের পরবর্তী পর্যায়ের রিপোর্ট ছিল অবিশ্বাস্য রকমের হালকা এবং তা উপস্থাপনও করা হয় অনেক গড়িমসির পর। অথচ দ্বিতীয় পর্যায়ে যেসব জেলায় তদন্ত চালানো হয়, সেগুলোর ব্যাপারেও একই ধরনের গুরুতর দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।

ঢাকা সিটি করপোরেশন এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পে 'সীমাহীন দুর্নীতি ও অনিয়ম হচ্ছে' মর্মে অভিযোগের প্রেক্ষিতে সেগুলো তদন্তের জন্য প্রায় দেড় বছর আগে অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকে পৃথক পৃথকভাবে ৪টি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু আজ পর্যন্তও জানা যায়নি এসব সাব-কমিটির কাজ কতদূর এগিয়েছে।

আওয়ামী লীগ একুশ বছর পর ক্ষমতায় এসেছিল। একুশ বছর ধরে জমিয়ে রাখা ক্ষুধা তারা যে যেভাবে পারে মিটিয়েছে এই ক'বছরে। আবার তারা ক্ষমতায় আসবে কিনা জানা নেই। সুতরাং আওয়ামী লীগের মন্ত্রী, নেতা-কর্মীরা অনিশ্চয়তায় থাকতে রাজি নয়। আর তাছাড়া নির্বাচন রয়েছে সামনে। তার খরচও তো জোটানো চাই। তাই শেষ মুহূর্তের এই ভাগ-বাটোয়ারা। এই একই ধরনের ভাগ-বাটোয়ারা পরবর্তীতে বিএনপি'র কাল হয়েছিল। এটা আওয়ামী লীগের জন্যও যে কাল হবে না সেটা বলা যায় না। কিন্তু লুটপাটই যেখানে এদেশের শাসকদের বৈশিষ্ট্য, সেখানে এ কাজে আশ্চর্যের কী! তবে শেষ সময়ের এই ভাগ-বাটোয়ারায় আওয়ামী লীগ যে রেকর্ড সৃষ্টি করল তার নজির পাওয়া যাবে না।